মোংলা বন্দর ঃ অতীত-বর্তমান এবং আশু করনীয়

যেকোন দেশে এবং বিশেষ করে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সমুদ্র বন্দরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে দেশের তিনটি চলমান বন্দর-চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা বন্দরের ভিতরে চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান ব্যবহার বলতে গেলে সর্বোচ্চ মাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছে। পায়রা বন্দরের কমবেশি ৮০ কি.মি চ্যানেল, কম হলেও ৩-৪ মিটার পর্যন্ত ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে খুব শীঘ্রই সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল উপযোগী করা সহজ কাজ হবে বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় মোংলা বন্দর চ্যানেলের বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত, 'বার'টি ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনাসহ পশুর নদীর ভাটিতে যেসব স্থানে পর্যাপ্ত পানির গভীরতা আছে সেসব স্থানে জাহাজ নোঙ্গর করানোর ব্যবস্থা করে দিলে মোংলা বন্দরকে একটি সময়োপযোগী ব্যবহারযোগ্য বন্দরে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সমুদ্র বন্দরের শুরুটা কার্যত ১৯৫০ সালের দিকে চালনা বন্দর দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু নদীতে পানির গভীরতা এবং সমুদ্রগামী জাহাজের আকার বিবেচনা করে ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে চালনা বন্দরের ১৮ কি.মি ভাটিতে অবস্থিত মোংলা নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয়। মোংলা নালা (নদী) এবং পশুর নদীর সংযোগস্থানে সেসব দিনে ১১টি 'সুইং মুরিং বয়ের' সাথে জাহাজ বাঁধার ব্যবস্থা ছিল। এসব মুরিং বয়ে ১০-২০ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন, ৮-৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এনে ভিড়ান যেত। পরে ১৯৮০ সাল পরবর্তী সময়ে খুলনা-মোংলা রাস্তা, গোটা পাঁচ-সাতে জাহাজ ভেড়ানর মত একটি পাঁকা জেটি বা 'পিয়ার', ৮টি গুদামঘর সহ বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য কমবেশি যাবতীয় অবকাঠামো গড়ে ওঠে। মোংলা নালার উজানেও বেশ ক'টা জাহাজ নোঙ্গরে থেকে কাজ করার ব্যবস্থা হয়। এসময় থেকে খুলনার পরিবর্তে, বন্দরের কার্য্যক্রম মোংলা থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে।

কিন্তু নব্বই দশকের দিকে নদীর নাব্যতা কমে যেতে শুরু করলে, (মূলত ফারাক্কা বাঁধের পরে, ৭০ দশকের শুরু থেকেই পশুর নদীর নাব্যতা কমা শুরু হয়েছিল) ১৯৯৮ সালে একবার এবং ২০০৯ সালে আর একবার ক্যাপিটাল ড্রেজিং করেও নদীর নাব্যতা ধরে রাখা যায়নি। ফলশ্রুতিতে মোংলা থেকে ২০-৩০ কি.মি দক্ষিণে 'বেজ ক্রিক' এবং 'হারবারিয়া' নামক স্থানে জাহাজ নোঙ্গর করানোর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বন্দর জেটিতে কম ড্রাফটের দু'একটি কার কেরিয়ার, কন্টেইনার জাহাজ এবং প্রোজেক্ট কার্গো জাহাজ সহ, বন্দর জেটির উত্তর দিকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কারখানার নিজস্ব জেটিগুলোতে ছোট আকারের কিছু এলপিজি জাহাজ, এডিবল অয়েল ট্যাঙ্কার ভিড়ানর ব্যবস্থা আছে। তবে বেজ ক্রিক বা হারবারিয়া নোঙ্গরের বর্তমান অবস্থাও ভালো নয়। এ জায়গাটিতে পানির গভীরতা কমে গিয়ে কমবেশি ৭.৫ মিটারে নেমে গেছে। ওদিকে বিগত বছরগুলোতে জাহাজ ব্যবসার ধরণেও পরিবর্তন এসেছে। ছোট আকারের জাহাজে মালামাল বহন করা ব্যয়সাপেক্ষ। আজকাল তাই হ্যান্ডিম্যাক্স (৫০-৬০ হাজার টন)

এবং প্যানাম্যাক্স (৬৫-৭৫ হাজার টন) জাহাজের ব্যবহার বেড়েছে। বড় আকারের এসব জাহাজ চলাচলের জন্য ১২-১৪ মিটার (৪০-৪৫ ফুট) বা কিছু বেশি পানির গভীরতা প্রয়োজন হয়। স্বভাবতই এ জাহাজগুলো সরাসরি মোংলা বন্দরে আসতে পারে না। এগুলো প্রথমে চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া / বহিরনঙ্গরের 'এ এঙ্করেজ'এ 'লাইটারিং' করে পরে চট্টগ্রাম বন্দর জেটি অথবা মোংলা বন্দরে এসে মালামাল খালাস করে।

এখানে উল্লেখ্য, পশুর নদীর সামগ্রীক গভীরতা কম, এমনটি কিন্তু নয়। এ নদীর কোন না কোন স্থানে ২০০-২২৫ মিটার লম্বা, ৫০-৭০ হাজার টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ নোঙ্গর করানোর মত পানি আগেও ছিল এবং এখনও আছে। শিবসা এবং পশুর নদীর সংযোগস্থানে ১১-১৬ মিটার বা তারও বেশি ড্রাফটের জাহাজ নোঙ্গর করানো সম্ভব। (সংযোজিত মানচিত্রে পশুর চ্যানেলের চার্টেড ডেপ্টথ বা সর্বনিম্ন পানির গভীরতা দেখুন)। আপাতত তাই, পশুর নদীর উজানে বড় আকারের কোন জাহাজ নোঙ্গর করানোর কথা চিন্তা না করে বেজ ক্রিক বা হারবারিয়া থেকে আরো দক্ষিণে 'আকরাম পয়েন্টের' কাছাকাছি জাহাজ নোঙ্গর করানোর ব্যবস্থা করা গেলে এ সমস্যার আশু সমাধান হবে। পাশাপাশি নিচে বর্নিত কাজগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া জরুরী।

১। মোংলা 'ফেয়ার ওয়ে বয়' (স্থলভাগ থেকে কমবেশি ৩০ কি.মি সমুদ্র গভীরে অবস্থিত) থেকে বন্দর চ্যানেলের উত্তর দিকে পানির গভীরতা অনেক বছর আগে থেকেই আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। পশুর চ্যানেলের সব থেকে বড় সমস্যা এখানে। কিছু কিছু জায়গায় এ গভীরতা ৬.১ মিটার পর্যন্ত নেমে এসেছে। এ স্থানটি 'বার' নামে পরিচিত। ৩ মিটার পানির 'রাইজ' ধরে, ভরা জোয়ারেও এ বারের ওপর দিয়ে ৮ মিটারের বেশি ড্রাফটের জাহাজ পশুর নদীতে আসতে পারে না। এ অবস্থাটি কাটিয়ে ওঠা একান্তই জরুরী। সেক্ষেত্রে ফেয়ার ওয়ে বয়ের ৬ কি.মি উত্তর দিক থেকে 'জেফারড পয়েন্ট লাইট হাউজ' পর্যন্ত চ্যানেলের যেখানে যতটা প্রয়োজন (কমবেশি ১০-১১ কি.মি জায়গা) খনন করে ৯ মিটার 'চার্টেড ডেপ্টথ' করে দেয়া গেলে এ সমস্যাটির সমাধান হবে। এ কাজটি করা গেলে, ভরা জোয়ারে ১২ মিটার ড্রাফটের জাহাজ পশুর নদীতে আসা-যাওয়া করতে পারবে। চাইলে 'বারের' নাব্যতা আরো কিছু বাড়িয়ে আরো বড় আকারের জাহাজ চ্যানেলে আনা সম্ভব। প্রয়োজনের তুলনায় কাজটি তেমন কোন ব্যয়সাধ্য কাজ না এবং শীতকাল হবে খনন কাজের উপযুক্ত সময়। পশুর নদীর উজানে নদীর নাব্যতা বাড়ানর চাইতেও সবার আগে 'বারের' এ 'বিষ ফোঁড়াটা' সরানো প্রয়োজন। 'বার' অতিক্রম করার পর, এসব বড় আকারের জাহাজ নদীতে ঢুকে প্রথমে আকরাম পয়েন্ট বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে নোঙ্গর করিয়ে আংশিক মাল লাইটার জাহাজে খালাস করে, প্রয়োজনে হারবারিয়া বা অন্য কোন স্থানে বাকি মাল খালাস করানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জাহাজ লোডিং এর ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাবে।

২। একটি জাহাজ বন্দরে আগমনের পর বহির্গমন পর্যন্ত পোর্টহেলথ, কাস্টমস, সার্ভেয়ার, শিপিং এজেন্ট, স্টিভেডর, শিপ চালডনারের মত অনেক সংস্থার লোকজন জাহাজে আসাযাওয়া করে। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাহাজে যাতায়াতের সুবিদার্থে মোংলা নালার ওপর একটি ব্রীজ এবং পশুর নদীর পূর্ব কিনার ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে 'জয়মনিগোল' পর্যন্ত (কমবেশি ২০ কি.মি পথ) গাড়ি চলার উপযোগী একটি পাঁকা রাস্তা নির্মাণ করে দেয়া জরুরী। বর্তমানে মোংলা নালা থেকে জাহাজ পর্যন্ত স্পিড বোট বা ধীরগতির লঞ্চ/জালি বোটে যেতে

হয়। এ রাস্তাটির পাশাপাশি জয়মনিগোলে ছোট ছোট নৌযানের থাকার জন্য একটি 'পোতাশ্রয়' নির্মাণ করে দিলে এসব নৌযানের, মোংলা নালার পরিবর্তে জয়মনিগোল থেকে জাহাজে যাওয়া-আসা করার সুবিধা হবে।

৩। বন্দরের উন্নতিকল্পে অন্য যেসব কাজ করা প্রয়োজন-

ক) ঘসিয়াখালি খালের নাব্যতা বজায় রাখা, খ) মোংলা থেকে ফেয়ার ওয়ে বয় পর্যন্ত সার্বক্ষণিক মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু রাখা, গ) আকরাম পয়েন্টে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য একটি স্থাপনা তৈরি করে দেয়া, ঘ) মোংলা বন্দরের নির্দিষ্ট একটি স্থানে জাহাজের ক্রু-অফিসারদের জন্য বাজারঘাট করাসহ বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেয়া, ঙ) স্টিভেডর কোম্পানিকে পোর্ট ক্রেন, ট্রেইলার, কন্টেইনার ক্রেডেলের মত-গ্রাব, পেলোডার জাতীয় যন্ত্রপাতি বন্দর থেকে ভাড়ায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা। চ) নৌ-পুলিশ সহ কার্যকর ঝঅজ (সার্চ এন্ড রেসকিউ) পার্টি গড়ে তোলা। ছ) যেখানে, যখন এবং যতটা প্রয়োজন খনন কাজ করার জন্য সাংবাৎসরিক একটি ড্রেজার নিযুক্ত রাখা। জ) বন্দর জেটি এবং তার উত্তর দিকে অবস্থিত কল-কারখানা জেটিগুলোর দিকে খেয়াল রাখা যাতে এসব জায়গায়ও নদীর নাব্যতা প্রয়োজন মত বাড়িয়ে জাহাজ আনা-নেওয়া করা যায়।

উপরে উল্লেখিত কাজগুলো সম্পন্ন করা গেলে মোংলা বন্দরটি অচিরেই একটি বড় এবং বহুল ব্যবহৃত বন্দরের স্থান করে নেবে বলে আশা করা যায়।

ক্যাপ্টেন শামস উজ জামান: মেরিন ক্যাপ্টেন, সার্ভেয়ার এন্ড কনসালটেন্ট